# বি হ ঙ্গ প্র ব ণ

## কা জী জ হি রু ল ই স লা ম

### তের

কোন এক রহস্যময় কারণে আব্বা প্রতি বছর এক বিশেষ মঙ্গলবার সারাদিনের জন্য বোবা হয়ে যেতেন । কোন কথা বলতেন না । প্রকৃত বোবা মানুষের মতো অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ওইদিন তিনি সকলের সঙ্গে ইশারা-ইঙ্গিতে যোগাযোগ করতেন । যে বছর এটা প্রথম শুরু হয় আমরা সবাই খুব ঘাবড়ে যাই । আম্মাতো হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করেন । আম্মা এবং আমি মিলে কতোভাবে চেষ্টা করলাম । কিছুতেই কিছু ফল হলো না । আব্বার মুখে কুলুপ আটা । নানান ভাবে আব্বাকে বিরক্ত, উত্যক্ত করা হচ্ছে । এমনকি আম্মা শাহনাজকে চিমটি দিয়ে কাঁদাচ্ছেন । শাহনাজের কান্না আব্বা একদম সহ্য করতে পারতেন না । সেই অসহ্য বিষয়টিও তিনি নীরবে সহ্য করে যাচ্ছেন । তাহলে কি উনার বোধশক্তি লোপ পেয়ে গেল ? খাওয়া-দাওয়া করছেন, কাজে যাচ্ছেন কিন্তু বান্দার মুখে কোন কথা নেই । হলোটা কি ? এই নীরবতার কারণ কি ? আম্মা পাড়া-প্রতিবেশী সবাইকে ডেকে জড়ো করলেন ।

ও আপা, ও ভাইজান, দেখেনতো কি হৈলো ? বাদলের আব্বা সকালে ঘুম থেকে উঠে আর কথা বলতেছে না ? ও পাপ্পুর আব্বা, আপনিতো ডাক্তার মানুষ । হঠাৎ করে কি এমন সুস্থ মানুষ বোবা হয়ে যেতে পারে ?
ভাবী দেখতেছি ।
একথা বলে পাপ্পুর আব্বা ঘরে ঢুকে দরোজা বন্ধ করে দেন । একঘন্টা পরে তিনি বেরিয়ে এসে বলেন, কিছুই বুঝতেছি না ।
ও আল্লাহ । তাইলে আমি এখন কি করবো ? উনি কি সত্যি সত্যি বোবা হয়ে গেলেন ?
অপেক্ষা করেন ভাবী । সবুরে মেওয়া ফলে ।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল । আমরা সবাই সবুর করে আছি কিন্তু মেওয়া ফলছে না । হুশেন মামা আর মেওয়ার অপেক্ষা না করে একটা দুষ্টু বুদ্ধি বের করলেন । আব্বার অতি প্রিয় মোটর সাইকেলের তালা খুলে ওটা নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন । তিনি আনাড়ী ড্রাইভার । যা হবার তাই হলো । গলির মাথায় উঠেই এক মুদির দোকানে তুলে দিলেন । গাড়ির হেড লাইট ভেঙে গেল, ক্লাচ এর লিভার ভেঙে গেল । দোকানেরও বেশ কিছু ক্ষতি হলো । গলির মাথায় হৈ চৈ চেচামিচি । সারা মহল্লার লোক জড়ো হয়ে গেল । আব্বা শোয়া থেকে উঠে বেরিয়ে গেলেন । আম্মা মনে মনে ভাবছেন, এইবার নিশ্চয়ই মুখ খুলবে । মামা একসিডেন্ট করে যে একটি উটকো ঝামেলা বাঁধিয়েছেন এটা যেন তখন আর কোন বিষয়ই না । আম্মার হাসি-খুশি ভাব দেখে মনে হচ্ছে এটা কোন নাটকের দৃশ্য । আব্বা

গিয়ে দোকানদারকে এক'শ টাকার একটি নোট দিয়ে মোটর সাইকেল নিয়ে বাসায় ফিরে আসেন । কিন্তু তবুও তিনি কোন কথা বলেন না ।

রাত দশটায় আব্বার বোবাসাধনা শেষ হয় । তিনি সুস্থ মানুষের মতো আবার কথা বলতে শুরু করেন । কেন সারাদিন বোবা হয়েছিলেন এই রহস্য আমরা আজো জানতে পারিনি । এরপর থেকে অনেক বছর পর্যন্ত তিনি বছরের একটি বিশেষ মঙ্গলবার সারাদিনের জন্য বোবা হয়ে যেতেন । আরো একটি ঘটনা ঘটতো আমাদের বাড়িতে । মাঝে মাঝে সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখতাম আম্মা গভীর মনোযোগ দিয়ে রান্না-বান্না করছেন । পোলাউ, মাংস, কাবাব, পায়েশ আরো কতো কি ? বিষয় কি ? আজ কি কোন বিশেষ মেহমান আসবে ? আব্বা সাথে করে দুপুরে একজন বিশেষ মেহমান নিয়ে হাজির হন । সেই বিশেষ মেহমানটি একজন ভিক্ষুক । আম্মা নিজের হাতে বেড়ে বেড়ে সেই ভিক্ষুককে পেট ভরে খাওয়াতেন । তার খাওয়া হয়ে গেলে এবং তিনি তার ঝোলাঝুলি নিয়ে বিদেয় হলে আমরা খেতে বসতাম । কিছুদিন পরে আবারো একই ঘটনা । আজকে অন্য আরেকজন, তিনিও ভিক্ষুক । এতো ঘটা করে ভিক্ষুক খাওয়ানোর মানে কি ? আমার শৈশবের অনেক অনুন্মোচিত রহস্যের মধ্যে এটিও একটি ।

চিকিৎসার এক পর্যায়ে আম্মার অনেক গহনা-পত্তরের সঙ্গে আব্বার অতি প্রিয় মোটর সাইকেলটিও বেঁচে দিতে হয়েছিল । সাড়ে সাত হাজার টাকার মোটর সাইকেল তিনি বেঁচে দেন মাত্র আড়াই হাজার টাকায় । সেই আড়াই হাজার টাকার পাঁচ'শ টাকা আবার বাকী । সেই বাকী আর কখনোই ফেরত পাওয়া যায় নি । অসুস্থতার নয় মাস আব্বার কাজকর্ম প্রায় বন্ধই ছিল ।

শহরের মধ্যম পর্যারে রেস্টুরেন্টগুলোতে চা পাতা এবং গুড়া দুধ সরবরাহের ব্যবসাটাই ছিল আব্বার মূল ব্যবসা । দোকানটা ছিল মূলত গোডাউন এবং বসার একটা জায়গা । আব্বার অবর্তমানে রেস্টুরেন্ট মালিকদের সাথে দেন-দরবার করে ব্যবসা করা মামার পক্ষে বেশ কঠিন হয়ে উঠেছিল । আমাদের কাছে মামাকে মনে হতো অতিশয় কৃপণ । ব্যবসা চালানো এবং সংসারের জন্য ব্যয় করার ক্ষেত্রে আব্বা ছিলেন এক রাঘব বোয়াল আর মামা তার পাশে এক পুচকে টাকি মাছ । টাকি মাছের টাকায় আমাদের আর কিছুতেই চলছিল না ।

আব্বা সুস্থ হয়ে উঠতে না উঠতেই বিটনের এক কঠিন আমাশয় রোগ দেখা দেয় । রক্ত আমাশয় । কতো ডাক্তার, কবিরাজ দেখানো হলো । কিন্তু আমাশয় মহাশয় আর ছাড়ে না ওকে । ওর শরীর শুকাতে শুকাতে এক পর্যায়ে এমন অবস্থা হয় যে ওর শরীরের চামড়া টান দিয়ে ছেড়ে দিলে আর সোজা হতো না, দলা পাকিয়ে থাকতো । চোখ দুটো আর মাথাটা ছাড়া সারা গায়ে আর দর্শনীয় কিছুই ছিল না । ওকে দেখলে ভয় লাগতো । আফ্রিকার ম্যালনারিশ বাচ্চাদের যেসব ছবি আমরা টিভিতে দেখি ঠিক ওরকম হয়ে গিয়েছিল ও দেখতে । ওর শরীরে কি কোন কারণে বিষ ছড়িয়ে পড়েছিল ? ফ্লোরের যেখানে যেখানে ও মলমূত্র ত্যাগ করতো সেই জায়গাগুলো পুড়ে যেত । শত ধুয়ে-মুছেও ঝলসানো ফ্লোর থেকে কিছুতেই শাদা দাগ তোলা যেত না । অবশেষে মহাখালীর সাততলা হাসপাতালে (তখনকার দিনে ওই হাসপাতালে যেতে সবাই ভয় পেত । কারণ ওখান থেকে খুব কম রোগীই ফিরে আসতো ।) ওকে নিয়ে আম্মা ভর্তি হয়ে যান । ওখানে সাতদিন থেকে ফিরে এলে আস্তে আস্তে ও সুস্থ হতে থাকে । রমজান মাসের এক তারিখে ওর অসুখটা শুরু হয় । পুরো একমাস পার করে ঈদের দিন সকালে এক পা দু'পা হেঁটে এসে আম্মাকে বলে, 'আম্মা মানসো কাবো' । আম্মার চুলায় তখন গরুর মাংস ভূনা হচ্ছে । ঈদের দিন ভোরে ও সুস্থ হয়ে ওঠাতে আমাদের সকলের মুখে ঝলমলে

আনন্দের দ্যুতি । সে বছর আমাদের ঈদটা অনেক কষ্টের এক দীর্ঘ অন্ধকার সমুদ্র পেরিয়ে উজ্জ্বল সৈকতে নতুন সূর্যোদয়ের মতো দেখা দেয় ।

অসুখ থেকে ওঠার পরে বিটন কিছু অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা অর্জন করে । ভবিষ্যতের কথা ও যা যা বলে সবকিছু হুবহু ফলে যায় । এক দুপুরে খেয়ে-দেয়ে আব্বা বাসা থেকে বের হয়ে যান আর ফিরে আসেন না । আম্মা পাগলিনী প্রায় । রাত দশটা, এগারোটা, বারোটা, একটা বেজে যায় । আব্বার ফেরার খবর নেই । আঙুলে আম্মার আঁচল পেঁচিয়ে আমিও জেগে আছি । এই বুঝি দরোজার কড়া নাড়ার শব্দ হলো । কোথাও কিছু একটা শব্দ হয় । আমি বলি, ওই যে পায়ের আওয়াজ, আব্বা এসেছে । আম্মা দরোজা খুলি ? আম্মা দৌড়ে গিয়ে গেইট খোলেন । যতোদূর চোখ যায় গলির মাথাটা দেখার চেষ্টা করেন । গেইট ধরে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন । কিন্তু কারো পায়ের আওয়াজ নেই ওখানে । আমরা ঘরে ফিরে আসি । আবারো প্রতীক্ষা । এই বুঝি আব্বা এলো, এই বুঝি আব্বা এলো । কিন্তু আব্বা আর আসেন না । কখন যে ঘুমিয়ে পড়ি টের পাই নি । ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখি, আব্বা এত্তো এত্তো ফলমূল নিয়ে সেই লাল মোটর সাইকেলে চড়ে ফিরে এসেছেন । এসেই বলছেন, ভয় পাইছিলা ? এই যে দেখো আমার বাপ্পিদের জন্য, আর মা-মনির জন্য কতো কিছু নিয়ে এসেছি । আমাদের প্রতীক্ষার সব কষ্ট দূর হয়ে যায় । আমরা আব্বার গলা জড়িয়ে ধরে আনন্দ করতে থাকি ।

সকাল হয় । আমি ঘুম থেকে উঠি । আম্মা তখনো দরোজার পাশে সিমেন্টের ফ্লোরের ওপর বসে আছেন । আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদছেন । মামাকে পাঠানো হয়েছে আব্বাকে খোঁজার জন্য । তিনি বিকেলে ফিরে এসে বলেন, সম্ভাব্য সব জায়গায় খুঁজে দেখেছি । কোথাও যায় নাই । তখনো হুট-হাট একে-ওকে ধরে নিয়ে যায়, গুলি করে মেরে ফেলে । কে যে কাকে ধরে নিয়ে যায়, কোথায় নিয়ে যায় কেউ জানে না । হাসপাতাল, থানা সর্বত্র খবর নেওয়া হলো । কোথাও নেই । অমঙ্গলের আশঙ্কায় কেঁপে উঠি আমরা । আমার খালি মনে হয় এমন কোন উপায়ে এই দুঃসহ দিনগুলোকে সিনেমার গল্পের মতো দ্রুত পার করে দেওয়া যায় না । মাঝে মাঝে মনে হয় আমি একটি স্বপ্ন দেখছি । ঘুম ভাঙলেই দেখতে পাবো, সব আবার আগের মতো হয়ে গেছে ।

কিছুই আগের মতো হয় না । আবারো সন্ধ্যা নামে কে,এম,দাস লেনে । আব্বাকে ছাড়া কি আমাদের আরো একটি রাত কাটাতে হবে ? নাকি আরো অনেকগুলো রাত কাটাতে হবে ? নাকি আর কোনদিনই আব্বাকে দেখতে পাবো না ? যদি তিনি আর কোনদিন ফিরে না আসেন তাহলে কি হবে ? মামা দ্বিতীয় দফায় খুঁজতে বের হন । রাত এগারোটা সময় ফিরে এসে জানান, কোন আত্মীয়ের বাড়িতে যান নি, কোন বন্ধুর বাড়িতেও না । তাহলে গেলেন কোথায় ? আম্মা বলেন, ভাই হুশেন, তর দুলাভাই কি আর ফিরে আসবে না ? বিটন তখন হেঁটে এসে আম্মার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, ‘আব্বু আতবে মঙ্গলবালে ।’

মঙ্গলবার সকালে আব্বা এসে হাজির । কোথায় গিয়েছিলেন ? এ প্রশ্নের কোন উত্তর নেই । ওইদিনই মাঝরাতে তিনি ঢুকরে কেঁদে ওঠেন । সারারাত কাঁদেন । কি হয়েছে ? আম্মা বারবার জিজ্ঞেস করেন । তিনি কোন জবাব দেন না, খালি কাঁদেন । পরদিন সকালে আম্মাও কাঁদেন । কি হয়েছে আম্মা ?

একাত্তুরে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া আমার একমাত্র চাচা সুরুজ কাজী বেঁচে নেই । কে বা কারা কুমিল্লার কোন এক স্থানে তার লাশ দেখেছে । সেটাও একাত্তুরেরই কথা । খবরটি এতোদিনে আমাদের কাছে

আসে । আব্বা কি সেই লাশের সন্ধ্যানে গিয়েছিলেন ? জানি না । এরপর প্রায়শই এরকম এক, দুইদিনের জন্য আব্বা নিখোঁজ হয়ে যেতেন ।

জুন মাসে আব্বা ঘোষণা করেন, ঢাকায় রেখে ফ্যামেলি মেন্টেইন করা তার পক্ষে আর সম্ভব নয় । কারণ ব্যবসায়ে লাল বাতি জ্বলে গেছে । লাল বাতির হাত থেকে আমাদের বাঁচতে হবে । সবুজ বাতির খোঁজে আমাদের গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হলো । গ্রাম মানে খাগাতুয়া । কারণ আব্বার বাপ-দাদার বাড়ি দৌলতপুরে আমরা কেউ যেতে চাই না । ওখানে কেউ আমাদের চেনে না, আমরাও কাউকে চিনি না । আব্বা নিজে গিয়ে আমাদেরকে নানাজানের হাতে সঁপে দিয়ে আসেন । নানাজানের মুখ দেখে মনে হলো, তার ঘাড়ে হঠাৎ দশ মনের এক বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে । তখন টইটুম্বুর বর্ষা । টইটুম্বুর বর্ষার ওপর ভাসছে খাগাতুয়া গ্রাম । এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে যাওয়ার একমাত্র বাহন হলো নৌকা । তিনদিন পর একটি ইঞ্জিনচালিত নৌকা এসে ঘাটে ভিড়ে । সেই নৌকা ভর্তি আমাদের সব জিনিসপত্র । আমার সেই প্রিয় পড়ার টেবিল (পড়ার জন্য না, মাইর খাওয়ার হাত থেকে বাঁচার একমাত্র নিরাপদ জায়গা বলে), ছোট্ট একটি খাট, আমার কেরামবোর্ড, পৃথিবীলুডু, দাবার কোর্ট আরো কতো কি । আমার আনন্দ আর ধরে না । খাগাতুয়ার বাচ্চারা কখনোই কেরামবোর্ড, দাবা, পৃথিবীলুডু দেখে নি । আমি ওদের এসব দেখাবো । ওদের এসব খেলা শেখাবো । ওরা বিস্মিত হয়ে যাবে । আমি ওদের বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে খুবই মজা পাবো ।

পৃথিবীলুডু ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় খেলা । বোর্ডের ওপর সারাবিশ্বের মানচিত্র আঁকা । বিভিন্ন স্থানের কিছু ছবিও আছে । ঢাকা থেকে খেলা শুরু । সারা পৃথিবী ঘুরে মক্কায় গিয়ে শেষ । অর্থাৎ ঢাকা হলো ১-এর ঘরে আর মক্কা ১০০-তে । মাঝখানের নম্বরগুলো বিশ্বের মানচিত্র ধরে সারা পৃথিবী এঁকে বেঁকে মক্কায় এসে শেষ হয়েছে । ৮৮-তে ছিল কঙ্গো । সেখানে ছিল এক অজগর সাপ । সেই সাপে খেলে নেমে আসতে হতো ৩১-এ । এখনো কঙ্গো নামটি শুনলেই আমার মধ্যে অজগর ভীতি জেগে ওঠে ।

খাগাতুয়ায় আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু তখন সেলেম । গ্রামের সবাই বাচ্চাদের বাবার নাম ধরে ডাকে । সেলেমকে সবাই বলে নবীর পুত । আমি যেহেতু নানার বাড়িতে থাকি, আমাকে সবাই ডাকে রুস্তম কাজীর নাতি । নবীর পুত আমার এসব খেলনা দেখে মোটেও বিস্মিত হলো না । এক জায়গায় বসে বসে খেলা ওরা কেউ পছন্দ করে না । সেলেম বলে, ইতান বেডিআইতের খেলা । জাগাত বৈয়া বেডাআইতে খেলেনিহিরে ? এক ঝটকায় উঠেই সেলেম দৌড় লাগায় । আমিও ওর পিছু পিছু দৌড়াই । দৌড়াতে দৌড়াতে বাড়ির পেছন দিকে, মঞ্জুরালীর ঘাটে গিয়ে ঝপাৎ করে পানিতে লাফিয়ে পড়ে সেলেম । পেছনে আমিও । তখনো আমি সাঁতার জানি না । গভীর পানিতে চলে গেলে যে ডুবে মরবো সেই ভয় আমার নেই ।

তখন পাট কাটার মৌসুম । বাড়ির বৌ-ঝিরা সারিবদ্ধভাবে ঘাটে বসে পচা পাট থেকে আঁশ তুলছে । শ্রাবনের মেঘলা আকাশ । যখন-তখন বৃষ্টি নেমে যায় । এতে কাজের কোন বিঘ্ন ঘটে না । ওরা ভিজতে ভিজতে পাট তোলে । বৃষ্টি চলে গেলে আবার রোদ ওঠে । ওরা রোদে পুড়তে পুড়তে পাট তোলে । রোদ-বৃষ্টির এই অত্যাচার ওদের নিত্যদিনের খেলা । ওদের মুখে বিরক্তির ছিটে-ফোটাও নেই । প্রকৃতির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই ওদের । সুরিয়া খালা, নূরজাহান খালা, মুলাজ খালাদের মুখে ধবধবে পাটের আঁশের মতো স্নিগ্ধ হাসি ।

সোনালী আঁশ তুলে গাঁট তৈরি করে নৌকার গলুইয়ের ওপর রাখেন মঞ্জুরালী নানা । এরপর শোলাগুলোকে আঁটি বেঁধে একটা ঘূর্ণি দিয়ে উঠানে ছেড়ে দিতেই শোলার আঁটিটি ঠ্যাং ছড়িয়ে লঙ স্কার্ট পরা বিদেশি মেয়ের মতো দাঁড়িয়ে পড়ে । স্থির, অনড় এক মেম, অদ্ভুত ভাস্কর্য । সেই ভাস্কর্যের গ্যালারি হয়ে ওঠে পুরো উঠান । আমি নতুন পাটতোলা শোলার মিষ্টি গন্ধে মাতাল হয়ে সেই গ্যালারির ভেতর ঘুরতে থাকি । মঞ্জুরালী নানা আধোয়া পাটের গাঁটভরা নৌকা নিয়ে খালপাড়ে, যা কোমর অব্দি পানির নিচে ডুবে আছে, চলে যান । চৈরটাকে (বাঁশের লগি) খালপাড়ে পুতে তার সঙ্গে নৌকা বেঁধে তিনি এক লাফে পানিতে নামেন । নৌকাটা তখন দুলে ওঠে । তিনি একটি একটি করে আধোয়া পাটের গাঁট খোলেন । কাপড় খলানোর মতো করে প্রবহমান পানিতে গাঁটখোলা পাটের লাছা ডানে-বাঁয়ে নেড়ে-চেড়ে ধুতে শুরু করেন ।

সুরিয়া খালারা একে অন্যকে নানান রকম শুল্লুক বলেন । কেউ সেটা ভাঙাতে পারলে অন্যরা হৈ হৈ করে ওঠেন । না ভাঙাতে পারলে হি হি হি হি করে হাসেন ।

‘উড়িতে ঝিকিমিকি, পড়িতে ধান্ধা
আঁধার করিয়া নামে, লেঙ্গুরটা বান্ধা’

কওছেন এইডা কি ?

মুলাজ খালা বলেন, কনিজাল ।
অইছে । সুরিয়া খালার পরাজিত কণ্ঠ ।
এবার নূরজাহান খালা বলেন,

‘আল্লাহর কি কুদরত
লাঠির ভিতরে শরবত’

বৈন এইডা খুবঅই সহজ । নাইরহল । শুল্লুক ভাঙায় সুরিয়া খালা ।
এবার মুলাজ খালার পালা । তিনি বলেন,

পানির তলে ইতল গাছ
কাটতে লাগে বারোমাস
কওছেন দেহি এইডা কি ?

সবাই চুপ । মাথার ওপরে আমগাছ । তার ওপরে শ্রাবনের আকাশ । ওখানে দুপুরের রোদ ঢাকা পড়েছে কালো একখন্ড মেঘের আড়ালে । মেয়েদের হাতগুলো পচা পাটগাছে সচল হয়ে ওঠে । পাঁচ/ছয়টি গাছের গোড়ার দিক থেকে আঁশ তুলে বাঁ হাতে ফুলের মতো গোছাগুলো ধরে ডান হাতে একটা থাপ্পর মারে গাছগুলোর ওপর । ছড়ত ছড়ত করে আঁশ থেকে শোলা আলাদা হয়ে যায় । মেঘ-রোদ্দুরের লুকোচুরি খেলা চলে তখন । মুলাজ খালার শুল্লুক কেউ ভাঙাতে পারে না । পরাজিত মুখে ওরা তাকায় মুলাজের চোখের দিকে ।

পারলা না ? এইডা ঐলো গিয়া ‘ছ্যাওয়া’ ।

বলেই হি হি হি হি করে হাসে মুলাজ খালা । অন্যরাও যোগ দিয়ে হাসির একটি কোরাস সঙ্গীত তৈরী করে ।

শুল্লুক যখন জমে ওঠে তখন চারু ফকির পা টিপে টিপে একটি নারকেলের হুকোতে গুড় গুড় গুড় গুড় শব্দে দম দিতে দিতে ঘাটে নেমে আসেন । চারু মিয়ার ঘরের পেছনেই মঞ্জুরালী নানার ঘাট । ঘাটের পাশের বড় আমগাছটির নিচে একটি গোবরের টাল (স্তুপ) । গোবরের টালের পাশেই কিশোরী-যুবতীদের পাটতোলার সারি । চারু ফকিরকে দেখে মুলাজ খালা নিজের পিঁড়িটি এগিয়ে দেন ।

তিনি বসতে বসতে বলেন,

আমি একটা শুল্লুক দেই । যদি তরা কেউ ভাঙ্গাইতি ফারছ, তৈলে হগলতেরে জিলাফি খাওয়াইয়াম ।

কথাটা বলেই চারু ফকির হুকোর ফুটোতে মুখ লাগান । গুড়ুর গুড়, গুড়ুর গুড় শব্দের সাথে সাথে কল্কি থেকে নীলচে ধোয়া উঠে শ্রাবনের মেঘ হয়ে যায় ।

ওক্কার ফুডা চুমান বন্দ কৈরা শুল্লুক কও জাউরা ফকির ।
সুরিয়ার কথায় যেন ধ্যান ভাঙে ফকিরের ।

‘চিকুন এক খাল
দুই ধারে তার বাল
মৈধ্যখানে লাল
স্বামী থাকলে দ্যায়
না থাকলে দ্যায় না’

ক দেহি এইডা কি ?

নূরজাহান খালা এবং মুলাজ খালা শাড়ির আঁচল টেনে মুখ ঢাকেন । সুরিয়া খালা বসা থেকে উঠে এক ধাক্কা মেরে চারু ফকিরকে পিঁড়ি থেকে ফেলে দিয়ে দৌড়ে মূল বাড়ির দিকে চলে যান । আর যেতে যেতে বলেন,

ধুরো বিজর্মা বুইড়া । তফাৎ যাও । তফাৎ যাও ।

চারু ফকির খুক খুক খুক খুক করে হাসতে থাকেন কিংবা কাশতে থাকেন । ওর হাসি বা কাশির দমক থেমে এলে আবারো হুকোর ফুটোয় মুখ লাগান । কিছুক্ষণ চোখ মুদে গুড় গুড় শব্দে বেশ আয়েশ করে হুকো টানেন । এরপর মুখ তোলেন ।

তরা বাবছত এইডা বুজি খাচ্চেরা কতা ? এইডা ঐলো গিয়া সিন্দুর । আরে দেহস না পছিম পাড়ার বিয়াতা হেন্দু বেডিআইতে হিতার (সিঁথি) মৈদ্যে সিন্দুর দ্যায় । জামাই থাকলেঐদ্দো দ্যায়, না থাকলে কি দ্যায় ? আর হিতাডা ঐলো গিয়া খাল । হিতার দুই ধারে কি থাহে ? কি থাহেলো মুলাজ ? চুল থাহে না ? চুলেরে উর্দুতে কয় ‘বাল’।

ঐছে চুপ করেন । আর শুল্লুক ভাঙ্গান লাগদোনা ।

নূরজাহান খালা, যার আর ক'দিন পরেই বিয়ে হবে, তার ধমকে চারু ফকির কথা বন্ধ করে ক্রমাগত হুকোতে চুমুতে থাকেন ।

মঞ্জুরালী নানার স্ত্রী কোমরে শাড়ি পেঁচিয়ে ভেতর বাড়ি থেকে ঘাটে নেমে আসেন ।

কৈ-ও চারুকাহা, আফনে বাড়িত যানছেন্দি । হেরারে কাম করতো দেন । আমি আফনের লাইগ্যা আলুফোড়া পাডাইতাছি ।

একটি নীল-সবুজ গাছকুড়ালি (কাঠঠোকরা) পাখি বড় আমগাছটিকে খুট খুট শব্দে ঠোকরাচ্ছে । আবারো ঝমঝম করে বৃষ্টি নামে । আর তখনি গাছকুড়ালিটি উড়ে যায় । বৃষ্টিতে পাটতোলা মেয়েদের দলটি ভিজে যায় । ওদের ভেজা কাপড় গায়ের সাথে লেপ্টে যায় । মঞ্জুরালী ততোক্ষণে ধোয়া, ফকফকে এক নৌকা পাট নিয়ে ঘাটে ফেরেন । পাটের ঝকঝকে রঙ দেখে ঘাটের মেয়েরাও একটি উজ্জ্বল হাসি উপহার দেয় আর ভেজা শরীরে লেপ্টে যাওয়া শাড়ি টেনেটুনে ঠিক করতে থাকে ।